শিক্ষাদর্শন

সাজ্জাদ জহির

একটি সুসংহত জাতিগঠন ও সফল আন্দোলনের জন্য বিশুদ্ধ মূল্যবোধ ও তরবিয়তের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষত মুসলিম জাতির জন্য একথা একথা বেশি প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ আকিদা ও নববি মানহাজের ওপর বেড়ে ওঠা জাতি জমিনের কর্তৃত্বলাভের জন্য যেমন জরুরি, একইভাবে তাওহিদের দাওয়াহ চলমান রাখা এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভের অন্যতম মাধ্যম।

আমাদের দেশে বা গোটা উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি ধারা বিদ্যমানঃ-

ক. কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক দরসে নিজামি এবং মাদানী নেসাব। এ শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজের উপযোগী বিশেষজ্ঞ আলেম প্রস্তুত করা।

খ. জাতীয় পাঠ্যক্রমের অধীন সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য সেক্যুলার রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক এবং সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী সরবরাহ করা।

গ. এডেক্সেল/ক্যাম্ব্রিজ কারিকুলামের আন্তর্জাতিক 'ও'/'এ' লেভেল বা ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষাব্যবস্থা; যা দুনিয়াব্যাপী বিশেষায়িত উচ্চশিক্ষায় অধিক কার্যকরী।

প্রথম দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থাই এ দেশে অধিক প্রচলিত। ফলে, পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, এই দুই ব্যবস্থার ফলে মানুষ হয় দ্বীনের পথে সূক্ষ্ম গবেষণার যোগ্যতা অর্জন করবে, অথবা ইসলামের বিপরীতমুখী সেক্যুলাঙ্গার ক্রোড়ে বেড়ে উঠবে। ১৩তম শতকের শুরু থেকে ইলমি কেন্দ্রগুলোতে—সমসাময়িক বাস্তবতা, পরিবর্তিত দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান, নতুন প্রজন্মের চাহিদার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করা দূরে থাক, এবিষয়ে ফিকির করাই ছিল অবিশ্বাস্য কল্পনা। ইলম চর্চার এমন এক ধারা সে সময় থেকে চলমান আছে, যার স্রোতে ভেসে আসা মস্তিষ্কে শারঈ ইলম এবং দাওয়াতি, আসকারি বা সিয়াসি ময়দানে ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

অবক্ষয়যুগের মুসলিম বিশ্বের ব্যাপারে আলোচনার এক পর্যায়ে শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহঃ বলেন,

> "মাদ্রাসা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলো চরম স্থবিরতা, নির্জীবতা ও বন্ধ্যাত্বের শিকার হয়ে পড়েছিলো।
>
> সেখানেও ছিল (বাস্তব) জ্ঞান ও চিন্তাগত অবক্ষয়ের ছাপ। মুসলিম বিশ্বের ওপর তখন জ্ঞান-বন্ধ্যাত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা এমন কঠিনভাবে চেপে বসেছিলো, যা থেকে জীবনের কোনো অঙ্গন মুক্ত ছিল না।"[1]

একথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা, যা 'দরসে নিজামী' হিসেবে সমধিক পরিচিত সেই অবক্ষয়যুগেরই ফসল। যার ফলে দরসে নিজামির ছাত্র হিসেবে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয়ার পর, উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে নেতৃত্বের দায়িত্ব নেয়ার সক্ষমতা গড়ে তোলা কঠিন থেকে কঠিনতরই হয়ে উঠছে। কুখ্যাত প্রাচ্যবিদ বার্নার্ড লুইস তার ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত 'The return of Islam' প্রবন্ধে বলেন,

> "আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতি কিংবা সময়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দ্বারা ইসলামকে সুসজ্জিত করে না এমন নেতৃত্বই বিজয়ী শক্তি হিসেবে ইসলামের গতিকে আটকে রেখেছে।
>
> এমন নেতৃত্বের অনুপস্থিতিই ইসলামি আন্দোলনগুলোকেও দমন করে রেখেছে। আর এমন নেতৃত্বই ইসলামি

আন্দোলনকে এক বিশাল রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে পারে।”

অন্যদিকে জাতীয় কারিকুলাম নামের বিষাক্ত সেক্যুলার শিক্ষাক্রম একেবারেই বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া উৎপাদন করে যাচ্ছে দ্বীনবিমুখ, আত্মপূজারী, পরশ্রীকাতর, উদ্ধত, লম্পট, অস্থিরচিত্ত, ত্বরাপ্রবণ ও বেয়াদব প্রকৃতির ছদ্মশিক্ষিত শ্রেণীর। যাদের অবস্থান সব ধরনের সুন্দর আখলাক থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে। এর জমিন এতই বিনষ্ট, তাতে যতই ইলম বা মাওয়ায়েজের পানি দেয়া হোক না কেন, তা কেবল আগাছাই উৎপন্ন করে। আর দিন দিন এই কারিকুলাম যে আরো নিম্নগামী হচ্ছে, তা কারোরই অজানা নয়। তবে আল্লাহ তা'আলা যাদের ওপর রহম করেছেন তাদের কথা ভিন্ন।

প্রি-মডার্ন যুগের অতি-বিশেষায়িত দরসে নিজামী আর পোস্ট-মডার্ন যুগের সেক্যুলার শিক্ষাক্রমের সাংস্কৃতিক ও চিন্তাগত দূরত্ব এত বেশি যে, উলামায়ে কেরাম ও সেক্যুলার শিক্ষিত দ্বীনদার শ্রেণীটির মাঝে মানসিক দূরত্ব ও সমন্বয়হীনতা মারাত্মক পর্যায়ের। আর দিন দিন তা বেড়েই চলেছে, যদিও অনেকে ভিন্ন দাবি করে থাকেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দরসে নিজামী ফারেগরা সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হতে আসলে পুরোদস্তুর সেক্যুলার বনে যায়। আবার সেক্যুলার-শিক্ষিতরা দরসে নিজামী বা তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের সহবতে গেলে প্রাচীন স্থবিরতারই উৎপাদকে পরিণত হোন, অথবা পরিণত হয় আলেমবিদ্বেষী বেয়াদবে। প্রত্যেকেই বিপরীত শিবিরে গিয়ে আক্রান্ত হোন “মুজতাহিদ সিন্ড্রোমে”!

যে ভারসাম্য অর্জনের ইচ্ছায় উভয় শ্রেণীর কিছু মানুষ একে অপরের শিবিরে গমন করেন, তা আর সম্ভব হয় না। বরং, কনভার্শনই ঘটতে থাকে। তবে বিশেষ ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

ফলে, আমাদের সমাজে বিশেষজ্ঞ আহলে ইলম ও আহলে আলমানিয়্যার (সেক্যুলারিজম) বাইরে 'আহলে ঈমান' নামক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক শ্রেণীটির উপস্থিতি ও মূল্যায়ন তুলনামূলক অনেক কম। সমাজে এ শ্রেণীটির অস্তিত্ব থেকে থাকলেও, তাদেরকে স্টেরিওটাইপ করা হয় জযবাতী অথবা জাহেল শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে। যা অত্যন্ত হতাশাজনক এবং চিন্তাগত স্থবিরতাকে স্থায়ীই করে তুলে।

অথচ, দুনিয়াবি ও দ্বীনি শিক্ষায় ভারসাম্যপূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী আহলে ঈমান শ্রেণীটিই ইসলামের ইতিহাসে মূল ভূমিকা রেখে এসেছে। কিংবা আরো ভালো করে বললে, ইসলামি ইতিহাস ও সমাজ বিনির্মানে প্রধানতম ভূমিকা এ শ্রেণীর ব্যক্তিরাই রেখে এসেছে। কেননা, ইসলামি ইতিহাসের রাজনৈতিক বা সামগ্রিক নেতৃত্বে আমরা সেসব ব্যক্তিবর্গকেই দেখি, যারা ইলমী ময়দানের তুলনায় রাজনৈতিক ও যুদ্ধের ময়দানে অধিক বিশেষায়িত ও তৎপর ছিলেন। ইলমের ব্যাপ্তি অনেক না হলেও, তাদের তাফাক্কুহ, তাকওয়া ও দূরদর্শীতার কমতি ছিল না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ শ্রেণীটির মধ্য থেকেই বরাবরই উঠে আসে জাতির অবিসংবাদিত নেতাকর্মীরা।

আমাদের সমাজে পরহেজগার আহলে ইলমের অভাব কমই বোধ হয়, এতে সন্দেহ নেই, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু উম্মাহর বিভিন্ন স্তরে সামাজিক, নাগরিক, রাজনৈতিক পরিপক্বতাসম্পন্ন আহলে ঈমানের সংকট আছে ব্যাপকভাবে। আর এ সংকট ও শূন্যস্থান নিরসনে আমাদের জাতির নব্বই শতাংশ মুসলিমের মাঝে সঠিক ও বিশুদ্ধ মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সমাজ ও আন্দোলনের উপযোগী শিক্ষানীতির প্রয়োজন রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে রাজনীতি, আন্দোলন, সংগঠন ও দাওয়াতি ময়দানে আমানত বহনে সক্ষম যুগসচেতন ও মুত্তাকি ঈমানদার সরবরাহ করা মুসলিমদের এক অপরিহার্য দায়িত্ব। শায়খ আবুল হাসান আলি নদবি (রহ.) বলেন,

> “এখন সময়ের অনেক বড় প্রয়োজন এবং মুসলিম বিশ্বের অনেক বড় সেবা হলো উম্মাহর বিভিন্ন স্তরে এবং সাধারন মানুষের মধ্যে সঠিক বোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। সবার জন্য সামাজিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।
>
> মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং মানুষের সংখ্যাধিক্য ঘটলে জাতির মধ্যে

সচেতনতাও থাকবে, এটি অনিবার্য নয়। যদিও এতে সন্দেহ নেই যে, শিক্ষার প্রসার ও জ্ঞানের বিস্তার সচেতনতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক। তবে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য মোটকথা স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা গ্রহণ ও ব্যাপক আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার একই কথা এজন্য বলতে হচ্ছে যে, আলমে ইসলামের জন্য এখন সবচেয়ে বড় খেদমত হলো, এমন বোধ ও প্রজ্ঞা, চেতনা ও প্রেরণা জাগ্রত করা যাতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি, ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কপটতা ও আন্তরিকতা, সংশোধন ও বিনাশ এবং হকের দাওয়াত ও বাতিলের শোরগোলের মধ্যে সহজেই পার্থক্য করতে পারে এবং গ্রহন-বর্জনের সঠিক ও নির্দ্বিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

বন্ধু যেন অবহেলিত না হয়, শত্রু যেন সমাদৃত না হয়; অপরাধী যেন নিস্তার না পায়; সৎ ও নিষ্ঠাবান যেন উপেক্ষিত না হয়।

নাগরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জটিল থেকে জটিল বিষয়ে মানুষ যেন পূর্ণ প্রজ্ঞার সঙ্গে চিন্তা করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরিপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী হয়।

এমন জাতি ও জনগোষ্ঠী যতক্ষণ আমরা না পাব, ততক্ষণ কর্মোদ্দীপনা ও কর্মযোগ্যতা এবং জাগতিক ও ধর্মীয় জীবনের জৌলুশপূর্ণ যাবতীয় প্রকাশ ও অভিপ্রকাশ জাতির ভাগ্য ও সময়ের গতিধারা ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ভূমিকাই রাখতে পারে না।”

জাতির মাঝে এই বোধ জাগিয়ে তুলতে উলামায়ে কেরামের পাশাপাশি সমাজের ইসলামি প্রকল্পগুলোর নেতৃত্বে থাকা দ্বীনদার শ্রেণীটির গুরুত্ব অপরিসীম। চাই তারা হোন দ্বীনি সংগঠন, মহল্লা, গ্রাম, দাওয়াহ সেন্টার বা মসজিদকেন্দ্রিক কমিউনিটির নেতা, সংগঠক বা সক্রিয় সদস্য।

১৮২৬ এর পর উসমানীয়দের দ্বারা ইসলামি প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয়করণ এবং পরবর্তীতে উপনিবেশবাদীদের কঠোর হস্তক্ষেপের পর ইলমি ময়দানে বিশেষায়িত আলেম প্রস্তুতের ধারাটিই কেবল অক্ষত থাকে। কিন্তু রাজনীতি, যুগসংস্কার, সংগঠন বা রণক্ষেত্রে যোগ্য নেতাকর্মীর উপস্থিতির ক্ষেত্রে দেখা দেয় চরম শূণ্যতা। কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া যার মারাত্মক প্রভাব গোটা মুসলিম বিশ্বেই দৃশ্যমান। সেই সংকট এখনো চলমান। বিদ্যমান সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা (ন্যাশনাল কারিকুলাম ও আলিয়া উভয়েই), ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা এ শ্রেণীটি প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়নি।

দূষিত সেক্যুলার আধিপত্য প্রতিরোধে ও ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে আলেমদের তদারকি ও দিকনির্দেশনার অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে ও থাকবে। থাকতে হবে। কিন্তু কিছু সাধারণ সংস্কারের বাইরে গিয়ে এই কষ্টসাধ্য ও মহান প্রকল্প বাস্তবায়নে ন্যূনতম সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তিত্ব সরবরাহে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও দরসে নিজামী উভয়ই অনুপযোগী। আর তা অনিবার্য কারণেই। এটি দরসে নিজামীর সমালোচনা না। বরং শারঈ ইলমের হেফাজত ও তত্ত্বাবধানের বিশেষ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দরসে নিজামী ইসলামি প্রকল্পের বড় একটি জিম্মাদারী আদায় করে আসছে। যার দরুণ দাওয়াতি, তাজদীদি, তানজিমি বা সিয়াসি ময়দানে মশগুল হতে আহলে ইলমগণ কিছুটা হলেও অপারগ। এটা সীমাবদ্ধতা নয়, বরং অনিবার্য বাস্তবতা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

আর সেক্যুলার পাঠ্যক্রম যা প্রণীত হয়েছে সেক্যুলার রাষ্ট্রের উপযোগী নাগরিক, আমলা ও কর্মচারী উৎপাদনের উদ্দেশ্যে, তা কখনো ইসলামিকরণের কর্মী ও নেতা সরবরাহে উপযোগী হতে পারে না। বরং, তা বিপরীত ফলাফলই এনে দিচ্ছে আমাদের। সেক্যুলার ঘরানা থেকে উঠে আসা সংগঠনের মধ্যে উলামায়ে কেরামকে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা এবং ভাসাভাসা শারঈ বুঝের বিস্তারের দিকে তাকালে আমরা এ করুণ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা উনাদের নেক আমলসমূহ কবুল করেন। এবং আমাদের সবাইকে ইসলাহ করে দিন।

আমাদের খুব ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে, এই আন্তরিক ও আগ্রহী শ্রেণীটিই সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটাই ইসলামি সমাজের ঐতিহাসিক ও স্বাভাবিক অবস্থা। তারাই হিদায়াতের চেরাগ, যারা রক্ত আর ঘামের মিশ্রণে জাতিকে উর্বরতা দান

করে। ইতিহাস এটাই বলে। সমাজ পরিচালনা, পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণে এ শ্রেণীটিই নিয়ামক ভূমিকা রেখে থাকে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবি, সাইফুদ্দিন কুতুজ থেকে নিয়ে খালিদ মুহাম্মাদ, আবু আবদুল্লাহ, আবু মুহাম্মাদ বা সালাহউদ্দিন যায়দানের মতো মহান ব্যক্তিরা এ শ্রেণীটিরই অন্তর্ভুক্ত। তাই, ইসলামের পুনরুত্থানে অগ্রগামী ভূমিকা রাখতে আগ্রহী সচেষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচ্ছন্ন ফিকির, বাস্তবতা ও শারঈ ইলমের উপলব্ধি এবং উদাসীনতা পরিত্যাগ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন —নেতৃবৃন্দ ও উলামায়ে কেরামের ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান। আহলে ইলম ও আহলে ফিকির শ্রেণীর সমন্বিত সম্পর্ক অত্যাবশ্যক।

লিবারেলিজমে প্রভাবে মুসলিম অধ্যুষিত সমাজগুলোতেও আত্মিক ও সামাজিক গুণাবলীর পরিবর্তে, লৌকিকতা ও বস্তুবাদী উন্নতিকে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার নষ্ট বিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে। অভিভাবকরা নিজ সন্তান বা অধীনস্তদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা আমলা বানানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। যার লক্ষ্য হল সহজে অর্থলাভ বা সমাজে নিজ সম্মান বাড়ানো।

অথচ মুসলিমের কাছে শিক্ষা স্রেফ ভোকেশনাল কোনো বিষয় নয়। ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে নিজের সাথে, সমাজের সাথে ও আল্লাহ তা'আলার সাথে মুয়ামালাত শেখানো। তারপর, পরিবার, এলাকা থেকে নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামি শরীয়াহর দাবি প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করা। যা কিনা আত্মিক, জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পথ ও চূড়া। শিক্ষিত মুসলিম ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য নিয়ে আত্মনিয়োগ করবে। মানুষের হিদায়াত তো বটেই, সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর কল্যাণেও আমৃত্যু লেগে থাকবে। আর মহান উদ্দেশ্যে তার মূল সম্বলই হবে জীবনের শুরুতে পাওয়া তালিম ও তরবিয়ত। এজন্য চাই, উম্মাহর উদ্যমী ও আন্তরিক সন্তানদের জন্য একটি সুসমন্বিত শিক্ষানীতি। যে শিক্ষানীতি পরিপূর্ণ চাহিদা পূরণ না করলেও, পরিবর্তনের বাতাস প্রবাহের জন্য জানালা খোলার প্রথম চেষ্টাটি করবে।

আর আল্লাহ তা'আলাই সর্বোত্তম তাওফিকদাতা।

[২]

সেক্যুলার রাজনৈতিক চক্র ও বুদ্ধিব্যবসায়ীদের নানামুখী চক্রান্তে মুসলিমদের বিশাল অংশ ঢালাওভাবে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় অংশ নেয়াকে গর্বের বিষয় মনে করে চলছে। দুঃখজনকভাবে, সাম্প্রতিক সময়গুলোতে জামাতিদের মতো আধুনিক চিন্তা লালনকারী পাশাপাশি কিছু আন্তরিক ইসলামপন্থীগণও সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতিকে হালকা করে দেখছেন ও দেখাচ্ছেন। কোনো শর্ত-সতর্কতা ছাড়াই ব্যাপকভাবে এতে অংশ নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। সমাজের মূল স্রোতে অংশ নেয়ার মতো কিছু ঢালাও আলোচনার দোহাই দিয়ে প্রজন্মকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে মারাত্মক আত্মঘাতী মানসিকতার দিকে।

হাল জমানায় ফ্যালাসি অফ জেনারালাইজেশন—একটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া প্রবণতা। সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, ফ্যালাসি অফ জেনারালাইজেশন (Fallacy of Generalisation) হল "পছন্দসই কিছু তথ্যের ভিত্তিতে ঢালাও সিদ্ধান্ত পৌছে যাওয়া"-কে আমরা বলতে পারি।

উদাহরণ উপলব্ধির চাবি।

"ধরা যাক কেউ একজন প্রচুর মদ খায়, কিন্তু সে খুবই সুদর্শন। এ থেকে কেউ সিদ্ধান্ত দিয়ে দিল—যারা মদ খায় তারা সুদর্শন হয়।"

এটি এক ধরনের ফ্যালাসি অফ জেনারালাইজেশন।

শাহবাগী সেক্যুলারদের কারণে এ জাতীয় আলোচনার সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত আছি। তবে বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে আন্তরিক কারো থেকেও অনিচ্ছাকৃতভাবে এমনটা হয়ে যেতে পারে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতা বা সম্মান আক্রান্ত হয় না। আল্লাহ তা'আলা সুস্থির রাখুন।

আমাদের দেশে ইসলাম ও সেক্যুলার ব্যবস্থার দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়ার মতো কোনো সংঘাত চলমান নেই। ইসলামপন্থীদের কমিউনিটি-কেন্দ্রিক অবস্থান এখানে অত্যন্ত দুর্বল। সমাজ ও রাষ্ট্রের সব অংশে সেক্যুলারদের প্রাবল্য প্রকট। এমন অবস্থায় সমাজের মূল স্রোত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলাটা সাধারণ নীতি সাব্যস্ত করাটা বাস্তবতা ও দ্বীনের চাহিদা নয়, এটাও ঠিক। কিন্তু, এটাও সঠিক অবস্থান নয় যে, ঢালাওভাবে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়) বা কর্মস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে নেতিবাচকভাবে দেখা হবে। অথবা, ঢালাওভাবে এতে সংযুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হবে।

এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য কী, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দেখা যাক—

> ‘শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য’—“এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে সেক্যুলার, গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে।” (পৃষ্ঠা :৭)

অর্থাৎ, বিপরীতধর্মী আদর্শ তথা ইসলামের বিরুদ্ধে সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার রণকৌশলের ভিত্তিই হচ্ছে এই শিক্ষাক্রম। এই সাধারণ বাক্যটি থেকেই এই উপসংহারে আসা যায় যে, সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের বিষয়টি কখনোই ঢালাওভাবে উৎসাহিত করা সংগত নয়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অধ্যায়নের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তাও যে খুব একটা নেই, তা স্থিরভাবে চিন্তা করলেও বোঝা সম্ভব।

তবুও, আলোচনার সামগ্রিকতার দাবিতে কিছু বলার চেষ্টা করা হচ্ছে—

ক. সমাজের মূল স্রোত মানেই সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় অংশগ্রহণ না। এখনো সমাজের পেশাজীবীদের সিংহভাগ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর নন। ন্যূনতম অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সেক্যুলার শিক্ষা কখনোই জরুরি না।

খ. বিশেষায়িত বা দক্ষ জনবলের সংকট নিরসনে ইসলামপন্থীদের করণীয় হচ্ছে, যারা এরইমধ্যে এসব শিক্ষাঙ্গন বা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন তাদেরকে ইসলামের গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসা। পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, দ্বীনের খেদমতের জন্য সেক্যুলার শিক্ষার আত্মীকরণের হার অনুল্লেখযোগ্য। বিপরীতে, সেক্যুলারদের মধ্যে আত্মিকভাবে সৎব্যক্তিদের মাধ্যমে “দ্বীনের খেদমত” তুলনামূলক বেশি, দ্রুতগামী ও ব্যাপক।

গ. ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের সংঘাতে ইসলামপন্থীদের সফলতা অর্জনে এখন বেশি প্রয়োজন তাওহিদ ও ইসলামের সঠিক শিক্ষার উপলব্ধি, সুন্নাহর আলোকে ইতিহাস ও ভূ-রাজনীতির জ্ঞান, পশ্চিমা সভ্যতার সমরনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে অবগত থাকা ইত্যাদি। যদি এক্ষেত্রে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিশেষায়িত ফায়দা হাসিল করতেই হয়, তাহলে তো অন্য কিছুর পরিবর্তে অগ্রাধিকার পাবে—দর্শন, নৃবিজ্ঞান, শান্তি ও সংঘর্ষ, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, ভূগোল বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদিতে অধ্যায়ন করা। সেক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকার জায়গা তো আর থাকছে না। আর সাধারণত কোনো ছাত্র মেধাতালিকার শেষদিকে স্থান না পেলে এসব বিভাগ নিতে চায় না, এটাই বাস্তবতা।

পাশাপাশি এসব নন-টেকনিক্যাল বিষয়ের পড়াশোনার পর ক্যারিয়ারের জন্য প্রথম ও শেষ ভরসা সাধারণত হয় বিভিন্ন এনজিও বা বিসিএস (যেখানে প্রবেশের মাঝে অকল্যাণ বেশি থাকায়, উলামারা অনুৎসাহিত করেন।)

ঘ. ইউনিভার্সিটিগুলোর সাংস্কৃতিক মান অত্যন্ত নিম্ন মানের। এই ইউনিভার্সিটিগুলো সাধারণত লৌকিকতাপ্রিয়, পরশ্রীকাতর ও আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠন করে। বিশেষ ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তবে তা একেবারেই নগণ্য। শুধুমাত্র খানকা, চিল্লা বা মাদ্রাসায় কিছু সময় কাটিয়ে সবার পক্ষে এই বিকারগ্রস্ত মানসিকতা ঝেড়ে ফেলা প্রায় অসম্ভব। যদি ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আসা র‍্যাডিকেল চিন্তাবিশিষ্ট ইসলামপন্থীদের পরিসংখ্যানও আমরা যাচাই করি, ভয়াবহ চিত্র বেরিয়ে আসবে, সন্দেহ নেই। আমাদের বহুল পরিচিত ইসলামপন্থী বা অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের অনেকের মাঝেও চারিত্রিক দৃঢ়তার সংকট রয়েছে। যার অন্যতম কারণ হলো, সেক্যুলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা।

ঙ. সেক্যুলার দার্শনিক সলিমুল্লাহ খান সহজভাবে বুঝিয়েছেন, প্রচলিত সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'প্রজাতন্ত্রের খাদেম বের করে নিয়ে আসা।' ১ম থেকে ২২তম গ্রেডের জন্য প্রয়োজনীয় লাখ লাখ দক্ষ লোক। শুধুমাত্র নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে এত কর্মী বের করে নিয়ে আসা সম্ভব না। শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের (১ম-৯ম গ্রেড) জন্য মানসম্মত সরকারি খাদেম নিয়োগের জন্য হলেও সেক্যুলার শিক্ষাকে ব্যাপক করা আবশ্যক। কেননা, ন্যূনতম স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা অর্জন ছাড়া বিসিএস/পিএসসির নিয়োগের আওতাধীন ইঁদুর দৌড়ে অংশই নেয়া সম্ভব না। এছাড়া, সেক্যুলার সিস্টেমের বৈধতা তৈরিতে সিভিল সোসাইটি বা বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় কিংবা অর্থনীতি সচল রাখতে টেকনিক্যাল পেশাজীবীরাও সক্রিয় ভূমিকা রেখে থাকে। তবে এক্ষেত্রে সরকারি চাকুরির চেয়ে কিছুটা প্রশস্ততা রয়েছে, এটাও ঠিক। আসলে এ ব্যাপারে আরো অনেক অনেক কথাই বলা সম্ভব।

সাধারণভাবে বলা যায়—এখন পর্যন্ত যারা সেক্যুলার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হননি এবং পারিবারিক চাপ উপেক্ষা করে বিরত থাকার সুযোগ যাদের আছে, তাদের জন্য এথেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মেহনতের জন্য বহু সুযোগ এইচএসসি উত্তীর্ণদের জন্য রয়েছে। আর স্ট্যাটাস মেইনটেইন এর চাহিদা তো কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তাই না? আর বিশেষভাবে বলা যায়, দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে অবগত, তাকওয়ার নিকটবর্তী ধীরস্থির কোনো দ্বীনী ব্যক্তির সাথে বিস্তারিত পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া, অগ্রসর হওয়া। কেননা দ্বীন ও দুনিয়ার সামগ্রিক চাহিদার আলোকে সিদ্ধান্তগ্রহণে তারতম্যের সুযোগ রয়েছে। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

পাশাপাশি, বাধ্য হয়ে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশ যদি করাই লাগে, তা হবে অস্বস্তিবোধ ও বিব্রতবোধের সাথে; স্বতঃস্ফূর্ততা, আগ্রহ বা শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির সাথে নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। সুতরাং যে বাধ্য হবে; অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তাহলে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-বাকারা, ০২:১৭৩)

সাঈদ ও মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন, غَيْرَ بَاغٍ অর্থ হচ্ছে, তাকে হালাল মনে না করে।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, "তা তৃপ্তি পরিমাণ খাবে না।"

ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত আছে, "অর্থাৎ মৃত প্রাণীর প্রতি আগ্রহী হবে না এবং তা খাওয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে না।"

কাতাদা বলেছেন, "যেমন হালালকে অতিক্রম করে হারাম খেল, অথচ সে তা না করেও পারে।"

কুরতুবী (রহ.) فَمَنِ اضْطُرَّ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, "তার ইচ্ছার বাইরে তাকে তা খেতে বাধ্য করা হয়েছে।"

তাই এমনটা কাম্য নয় যে, আমরা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশের বিষয়টি মহিমান্বিত করে ফেলব, মানুষকে আগ্রহী করে তুলব বা খুব সাধারণ বিষয় হিসেবে প্রচার করব। কেননা সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার মাঝে মুসলিমদের জন্য সম্ভাবনার চেয়ে আশঙ্কাই বেশি। যার ঈমান আর ব্যক্তিত্বের জোর আছে সে দূরে থাকবে। আর অন্যরা বাধ্য হয়ে প্রবেশ করলেও, পরামর্শক্রমে জরুরতের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রবেশ করবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আরো বলা যায়, সাম্প্রতিক সময়ের কথা বাদ দিলে, ১৮ বছর বয়সের ব্যক্তিদের কাছে পৌরুষ আশা করাটাই ছিল স্বাভাবিক।

অধঃপতিত সমাজের স্বাভাবিক বাস্তবতা হিসেবে, সমাজে বালকরূপী পুরুষের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু এজন্য শারঈ ও দ্বীনের দাবি উল্টে যায় না। সমাজ বৈরী বা মানুষের ঈমান দুর্বল বিধায়, শৈথিল্যপরায়ণতা কেন প্রকাশ পাবে? মানুষের জন্য ঢালাওভাবে রুখসত বের করে দেয়া হিদায়াতের জন্য মেহনতকারীর জিম্মা না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

---

[1] মা যা খসিরাল 'আলাম পৃষ্ঠাঃ ২৭৮ দারুল কলম